নদী সংযোগ প্রকল্প প্রসঙ্গে

সজল ঘোষ

আমাদের স্বাধীনতার দিনের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি তাঁর যে সব মূল্যবান বার্তা ভারতবাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, ত ারই সামান্য এক অংশে নদী - সংযাগ প্রকল্পের দ্রুত রূপায়নের ওপর জোর দিয়েছেন, যে প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতে বন্যা - খরা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উপায় চিহ্নিত হয়েছে। গুজরাট বা মহারাষ্ট্রে ২০০৫ সালের বন্যা প্রত্যেক সচেতন ন াগরিককেই ব্যথিত করে, আর তাই বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নদী-সংযোগ প্রকল্পের কথা মনে হয়। অথচ হয়ত মনে পড়ে না ২০০৪ সালে গুজরাটের ঐ সব অঞ্চলের তীব্র খরার কথা। এই প্রকল্পের ভারতকে ভাগ করা হয়েছে জল - উদ্বৃত্ত অঞ্চল জল - ঘাটতি অঞ্চলে। আর এই বিভাজনের মূল ভিত্তি হল যথাক্রমে বন্যাপ্রবণ ও খরাপ্রবণ অঞ্চল, যে হিসাবে গুজরাট জল - ঘাটতি অঞ্চলের অধীন। তাই যেখানে খরা সমস্যার জন্য অতিরিক্ত জল সরবরাহের কথা, সেখানে সেই জল কিভাবে বন্যারোধ করতে পারে তা পরিষ্কার নয়। শুধুমাত্র এক বছরের দুর্যোগকে মাথায় রেখেএমন একটি চিরস্থ ায়ী প্রকল্পের দ্রুত রূপায়নে জোর দেওয়া কতটা যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে, বিশেষত যেখানে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও সম্ভাব্য প্রভ াবের দিকটি এখনও অবহেলিত রয়ে গেছে। যে সাধারণের সুবিধার কথা ভেবে এই প্রকল্পের পরিকল্পনা, সেই সাধারণ মানুষকেই জানানো হয়নি প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য। এমন কি তাঁদের মতামতও সেভাবে চাওয়া হয়নি। অথচ দুই রাজ্য সরকারের মধ্যে ইতিমধ্যেই ঠিক হয়ে গেল কেন ও বেতোয়া নদীর সংযোগকরণ। তাই নদী - সংযোগ প্রকল্পের যথার্থতা বিশ্লেষণ এবং বিকল্প কোন ভাবনার সন্ধান, সবটাই আলোচনার অপেক্ষা দাবি করে। বুঝে নেওয়া প্রয়োজন প্রতিটি গুত্বপূর্ণ নদীর বৈশিষ্ট্য আর তাদের বিন্যাস, বৃষ্টিপাতের বন্টন, বন্যা, খরার ইতিহাস এবং অবশ্যই এই প্রকল্পর গ্রহণযে াগ্যতা।

।। ভারতের নদী পরিবেশ ।।

বহু নদীর সিঞ্চনে লালিত আমাদের এই দেশ, আমাদের ভারত। চরিত্র আর বৈশিষ্ট্যে প্রতিটি নদীর সঙ্গে প্রতিটির একট াই ফারাক যে সব মিলিয়ে এক বিচিত্র নদী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ভারতে প্রবাহিত অসংখ্য নদীর প্রবাহীরেখা, প্রবাহের জলভার, তিল তিল সঞ্চয়ে গড়ে তোলা ভূমিরূপ, ইত্যাদি দিকচিহ্ন বিশ্লেষণের শেষে বেরিয়ে আসে একটা ছন্দ। দেখা য ায় ভারতের প্রধানতম নদীগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মোট নয়টি নদী, যেমন, সিন্ধু-শতদ্রু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, নর্মদা, তাপ্তী, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা আর কাবেরী। এই নদীগুলির মধ্যে সিন্ধু ও তার উপনদী শতদ্রু, গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র উত্তরের উত্তুঙ্গ হিমালয়ের পার্বত্য রাজ্য থেকে এসেছে ভারত, বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের সমতলে। নর্মদা, তাপ্তী, এবং মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা আর কাবেরী, এই নদীগুলির মধ্যে সিন্ধু ও তার উপনদী শতদ্রু, গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র উত্তরের উত্তুঙ্গ হিমালয়ের পার্বত্য রাজ্য থেকে এসেছে ভারত, বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের সমতলে। নর্মদা, তাপী, এবং মহানদীর জন্ম মধ্য ভারতের মালভূমি অঞ্চল থেকে। ওদিকে ভারতের পশ্চিম উপকূল বরাবর শুয়ে থাকা পশ্চিমঘ াট পর্বত থেকে নেমে আসা গোদাবরী, কৃষ্ণা আর কাবেরী দাক্ষিণাত্যের মালভূমির বুক চিরে ছুটে চলেছে বঙ্গোপস াগরের দিকে। এই সব নদী ছাড়া আরও তিনটি উল্লেখযোগ্য নদী যেমন লুনি, সবরমতী ও মাহের উৎপত্তিস্থল আরাবল্লী অঞ্চল। তাই দেখা যায় ভারতেরর প্রধান নদীগুলি তাদের উৎসভূমি অনুযায়ী যেন তিনের ছন্দে বাঁধা আছে (চিত্র১)। নদীতো আরও আছে। আছে সুবর্ণরেখা, পেনার,ভাইগাই, তাম্রপর্ণী। ওদিকে শরাবতী, পেরিয়ার। কেউ বা এসেছে পশ্চিমঘাট পাহাড় থেকে, কেউবা পূর্বঘাট থেকে, আর উত্তরের পাহাড়তো আছেই। কেউ চলেছে আরবসাগরে, আব ার বঙ্গোপসাগরও কত নদীর মোহনা ছুঁয়ে আছে। সব মিলিয়ে বহু নদীর শতধায় সিক্ত এ দেশের ভূখন্ড। যারা এসেছে

হিমালয়ের কোল থেকে যেমন সিন্ধু, গঙ্গা বা ব্রহ্মপুত্র, অথবা তাদের উপনদী, যেমন শতদ্রু, যমুনা, তিস্তা বা মানস, অথবা আরও অনেক, তারা হিমচূড়ায় প্রবাহিত বরফ স্তূপ থেকে, তাদের জমাট দেহ থেকে, তরল ধারায় জন্ম নিয়েছে। সারা বছর ধরেই তাই তারা মাতৃ হিমবাহ থেকে জল পায়। তার ওপর আছে বৃষ্টির জল। আমাদের দেশের অধিকাংশ বৃষ্টি হয় মৌসুমী হাওয়ার পথ ধরে। তার ধাক্কায় যে জল পাহাড় বেয়ে নামতে থাকে, ধারায় ধারায় যুক্ত হয় নদীপ্রবাহে। মৌসুমী বৃষ্টি শু হয় পূর্ব হিমালয়ে, আর ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমদিকে। তাই পূর্ব হিমালয়ের বৃষ্টিও বেশি। পূর্বদিকে বয়ে যাওয়া গঙ্গাআর ব্রহ্মপুত্রের জল তাই আরও ফুলে ফেঁপে ওঠে। আর যে সব নদী হিমজল পায়না, বর্ষার ধারা নিয়ে প্রবহমান, বর্ষাহীন সময়ে তাই ক্ষীণকায়া।

যদি বিন্ধ্যপাহাড়কে সীমারেখা ধরা যায়, তবে তার উত্তরের অধিকাংশ নদীই হিমালয় থেকে নেমে এসেছে সমতলে। ত াদেরমধ্যে অনেকেই আবার বরফগলা জল আর বৃষ্টি জল, দুই উৎসেরই ভাগীদার, সে সব নদীতে জলের ভাগও বেশ, পলির ভাগও বেশি। আর সেই পলির ক্রমাগত সঞ্চয়ে গড়ে উঠেছে উত্তর ভারতের সেই বিশাল সমভূমি যার তুলনীয় গোটা বিশ্বে পাওয়া মুশকিল। জেগেউঠছে নতুন নতুন দ্বীপ, দ্বীপ থেকে বদ্বীপ, আজ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় এই আশ্চ র্য পলিভূমিতে তাই গা ঘেঁষাঘেঁষি করেও বহু ভারতীয়দের বাস, কেননা এই পলিভূমিই তৈরিকরেছে সুন্দরতম কৃষিভূমি। অপর দিকে বিন্ধ্যপাহাড়ের দক্ষিণের কোন নদীই বরফজল পায় না। তবু অনেকেই বঙ্গোপসাগর মোহনায় গড়ে তুলেছে বদ্বীপ। জীবনযাপনের অনুকূল এই সমৃদ্ধ বাসভূমি। ভারতে প্রবাহিত দীর্ঘতমনদীটি হল গঙ্গা। আর তার অববাহিকার আয়তন ভারতে বৃহত্তম। কিন্তু প্রবাহের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি ব্রহ্মপুত্রে। আর শুধু দক্ষিণভারতের নদীগুলো বিচার করলে দেখা যাবে দৈর্ঘ্য, প্রবাহ পরিমাণে বা অববাহিকার আয়তনে, সবেতেই প্রথম গোদাবরী নদীটি। ভারতে প্রবাহিত এই সব নদী প্রতিটিই খুব সুন্দর। তারা প্রায় প্রত্যেকেই তাদের প্রবাহ পথে স্থিতিশীল। কখনো তারা পবিত্রতায় দেবীর আসনে পূজ্য। তাদের দাপুটে প্লাবনে বহু মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও, সেই সব অতি সাধ ারণ মানুষ কখনও চাননি, এই নদী মরে যাক, শেষ হয়ে যাক। যে তিস্তা নদী জলপাইগুড়ি শহরকে ভাসিয়ে দেয়, তাকেই মানুষ আদর করে ডাকে তিস্তাবুড়ি। যে কোনও অশুদ্ধতাকে মুছে দেয় গঙ্গা নদীর জল। নর্মদা নদী পরিক্রমা এক ধর্মীয় য াত্রা। আমাদের দেশের জনজীবনে তাই নদী মিশে আছে বহুরূপে। ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরতর শেকড় ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে নদীর প্রবাহ।

তবুও নদী তো প্রকৃতিরই সন্তান। যে জল পৃথিবী ধারণ করে, সেই তো ধারা হয়ে নদীর হয়। মানুষ কখনও নদী তৈরি করতে পারে না। সে নদী তৈরি করতে গেলে খাল তৈরি হয়। নদীর বয়ে চলার যে প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, তাতে মানুষ হাত দিলে যে পরিবর্তন আসে, মানুষ তার কোন নিয়ম জানে না। মানুষ নিয়ন্ত্রিত নদী যে পরিবর্তন ক্রমাগত আনতে থ াকে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা তার নেই। আর তখনই ধবংস হয় সভ্যতা, বিপর্যস্ত হয় সমাজ। মানব সভ্যতার ইতিহাস তাই নদী ছাড়া হয় না, সে সভ্যতায় জল এক চিরকালীন প্রভাবক। আর সেই কারণেই ডোনাল্ড উরস্টার বলেন সেই আমোঘ কথাগুলি, 'to write history without putting any water in it is to leave out a large part of the story. Human experience has not so dry as that.' বর্তমান ভারতে জল আর জলহীনতার সমস্যা নিয়ে যখন নতুন অথচ অপরিণত ভাবনা জননেতাদের মধ্যে, আমলাদের মধ্যে, ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে, জারিত হতে থাকে, তৈরি হতে থাকে অসম্পূর্ণ যুক্তির রসায়ন, তখন ঐ কথাগুলি বারবার ঘুরে ঘুরে মনে পড়ে যায়। তাই প্রয়ে াজন হয় সুযুক্তির। সব নদীকে জুড়ে দেওয়ার যে পরিকল্পনা বন্যা আর খরা সঙ্কটের মোকাবিলায় তৈরি হয় সেই পরিকল্পনা সমাজ সভ্যতায় নতুন নতুন বাঁক নিয়ে আসতে পারে, তাকে বুঝে নেওয়া তাই ভীষণ জরি।

।। নদী সংযোগ প্রকল্প ঃ প্রেক্ষাপট ও মূল প্রতিপাদ্য ।।

হিসাব করে দেখা যায় সারা বছর ধরে ভারত বৃষ্টিপাত থেকে জল পায় প্রায় ৪০০০ ঘন কিলোমিটার। এই জলের অনেকটাই উবে যায় বাষ্প হয়ে, শুষে নেয় মাটি আর গাছপালা। এসব ছেড়ে, নদী বয়ে যায় ১৮৬৯ ঘন কিলোমিটার জল আর মাটির নীচে জমা হয় ৪৩২ ঘন কিলোমিটার জল। বৃষ্টি যে জল দেয়, তার থেকে আমরা ব্যবহারযোগ্য মোট জল পাই ১১২২ ঘন কিলোমিটার। আর তাই প্রতিটি ভারতবাসীর বছরে মাথাপিছু জলের বরাদ্দ মাত্র ১৮২০ ঘন

মিটার পরিমান। এখন আমাদের জনসংখ্যা ১০২ কোটি ছাপিয়ে গেয়ে। ১৯৫০ সালে যখন জনসংখ্যা ছিল ৩৬ কোটি, তখন মাথা পিছু জলের পরিমান ছিল ৫১৭৭ ঘন মিটার। অর্থাৎ জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের ভাগে জলের পরিমাণ কম পৌঁছাবে। তবে পাশাপাশি একথা মনের রাখা দরকার যে, এই বৃষ্টির জল ভারতের সর্বত্র সমান পাওয়া যায় না। আবার একথাও সত্যি যে, যেখানে জলের সুবিধা বেশি সেখানে মানুষের চাপও বেশি। যেহেতু পূর্ব হিমালয়ে বৃষ্টির পরিমান বেশি, তাই পূর্ব ভারতে নদীগুলো বর্ষার জল পায়ও বেশি। এই সময় গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, আর মধ্য ও পূর্ব হিমালয় থেকে নেমে আসা অন্যান্য নদী জলে ভরে থাকে। প্রায়ই তৈরি হয় বন্যা পরিস্থিতি। আবার ভারতের দক্ষিণ ও মধ্য অংশে, কিছুটা অন্যান্য অংশেও, বছরের একটা সময় খরা চলতে থাকে। তাই খরা ও বন্যা, এই দুই পরিবেশ বিপজর্যকে মোকবিলা করবার জন্য বলা হল খান কেটে বিভিন্ন নদী যুক্ত করবার কথা। যে সব নদীতে জল বেশি সেখান থেকে জল নিয়ে দেওয়া হবে শুষ্ক অঞ্চলের নদীতে। এই ভাবনা থেকেই তৈরি হল নদী সংযোগ প্রকল্প।

নদী - সংযোগের কথা প্রথম বলেছিলেন স্যার আর্থার কটন। সময়টা ছিল উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ। সেই সময় ভারতের বিভিন্ন অংশে রেলপথ সম্প্রসারণের কথা চলছে। তখন অবশ্য বন্যা খরার মোকাবিলায় নদী - সংযোগের কথা বলেননি। তিনি রেলপথের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে জলপথের কথা বলেন। সেই উদ্দেশ্যেই গঙ্গা, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা আর কাবেরী, এই পাঁচটি নদীকেখালের সাহায্যে যুক্ত করার কথা বলেন। যদিও তাঁর সেই প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি। স্বাধীনতার পর ষাটের দশকের শেষদিকে, সেই সময়কার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কে.এল.রাও 'গঙ্গা - কাবেরী লিংক ক্যানালের কথা বলেন। এই প্রস্তাব জলসেচের সম্প্রসারণের জন্য। তখন ডঃ মেঘনাদ সাহার উৎসাহে ও পরিকল্পনায় নদীতে বড় বড় বাঁধ দিয়ে জলাধার নির্মাণ ও শুখা মরসুমে সেখান থেকে জল নিয়ে কৃষি জমিতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা খুবই কার্যকরী হিসাবে গৃহীত হয়েছে। বাঁধ তৈরি করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ আর জলাধারকে অতিরিক্ত জলসেচের জন্য ব্যবহার করে, নদীকে বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগী করে তোলবার মানসিকতায় মানুষের মধ্যে যে নদীকেও পোষ মানানোর নেশা ক্রমশজনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তারই প্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালে কে.এল.রাও একটি জাতীয় নদী গ্রিডের (National River Grid) কথা বলেন। এই ব্যবস্থার মূল কাঠামোটি ছিল অবশ্য একপেশে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র থেকে উদ্বৃত্ত জল পাঠাতে হবে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের শুখা অঞ্চলে। কিন্তু পশ্চিম বা উত্তর - পশ্চিম ভারতের কথা এক্ষেত্রে বলা হল না। ১৯৮০ সালে ক্যাপ্টেন ডি.দস্তুর গারল্যান্ড ক্যানালের (Garland Canal) প্রস্তাব দিলেন। এই প্রস্তাবে হিমালয়ের দক্ষিণ ঢাল বরাবর ৪২০০ কিলোমিটার লম্বা আর ৩০০ মিটার চওড়া এক খাল কাটার কথা বলা হল। আর একটা খাল যেটি ৯৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ, কাটা হবে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের ভেতর দিয়ে। তারপর উত্তর ও দক্ষিণের খালদুটকে পরস্পর যুক্ত করা হবে ৩.৭ মিটার ব্যাসযুক্ত দুটি পাইপ দ্বারা, দিল্লী ও পাটনা শহরে। কেন্দ্রীয় জল মন্ত্রক (National Water Commission) অবশ্য রাও এবং দস্তুর, দুইজনের প্রস্তাবই সবদিক থেকে খতিয়ে দেখে বাতিল করে দেয়। যদিওএই ধরণের নদী - সংযোগ প্রকল্প বাতিল করে দেওয়া হল, কিন্তু বন্যা ও খরা সমস্যার সমাধানের জন্য যে ধারণাটি চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা শু হল, তাহল 'উদ্বৃত্ত জল' ও 'ঘাটতি জল' -এর ধারণা এবং গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রকে উদ্বৃত্ত জলের নদী হিসাবে চিহিত করা হল। সুতরাং কিভাবে ঐদুটি নদীর জল অন্যত্র টেনে নিয়ে সেটের কাজে ব্যবহার করা যায় সেই পরিকল্পনাই প্রাধান্য পেল।

তাই ১৯৮২ সালে ভারত সরকার নদী সংযোগের মাধ্যমে জাতীয় নদী গ্রিডের সম্ভাব্য দিকগুলি খতিয়ে দেখবার জন্য গঠন করল জাতীয় জল উন্নয়ন সংস্থা (National Water Development Agency). বিগত দুই দশক ধরে নানা ভাবনা চিন্তার পর তিরিশটি নদী সংযোগকারী খালের কথা বলা হয় এবং একটি রিপোর্ট জমা দেয়। তবে এখন পর্যন্ত কোন বিশদ প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরি হয়নি। যদিও ২০০২ সালের ৩১শে অক্টোবর সুপ্রীম কোর্ট এই প্রকল্প দ্রুত শেষ করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ দেয়। আর ডিসেম্বর মাসেই তৎকালীন সরকার ভারতের উপদ্বীপ অংশে অন্তত ছয়টি নদী সংযোগকারী খাল নির্মাণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত করা হল। ২০০৬ সালের মধ্যে সব দিক খতিয়ে নিয়ে প্রকল্পের কাজ শু করে ২০১৬ সালের মধ্যেই যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে প্রকল্প অনুযায়ী সব কাজ সম্পন্ন করবার জন্যই এই টাস্ক ফোর্সটি তৈরি হয়।

বর্তমান নদী - সংযোগ প্রকল্পে যে সব সংযোগকারী খালের কথা বলা হয়েছে, তাদের দুটি ভাগ আছে। প্রথম ভাগটি হল হিমালয় অংশ। এই অংশে মূলত উত্তর ভারতের বিভিন্ন নদীগুলির মধ্যে ১৪টি খাল তৈরি হবে, আর এগুলি যুক্ত করবার জন্য ৯টি বড় বাঁধের সাহায্য নেওয়া হবে। অপরদিকে দ্বিতীয় ভাগটি হল উপদ্বীপিয় অংশ। এই অংশে তৈরি হবে মোট ১৬টি খাল আর ২৭টি বাঁধ।এই সব খালের মধ্যে মোট ১৭৩ মিলিয়ন ঘন মিটার জল, উদ্বৃত্ত অঞ্চল থেকে ঘাটতি অঞ্চলে সরবরাহ করা হবে। এই জলের সাহায্যে আরও ৩৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎও এই প্রকল্পের মাধ্যমে উৎপন্ন হবে। পাশাপাশি কাজের ক্ষেত্রেও অন্তত ৩৭ মিলিয়ন মানববর্ষ তৈরি হবে। আর সামগ্রিকভাবে ৪০/০ জি. ডি. পি. বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। অর্থাৎ নদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে বহুমুখী সুবিধা পাওয়ার একটা ক্ষেত্র তৈরি হবে। এই প্রকল্প থেকে যে সব সম্ভাব্য সুবিধা পাওয়া যাবে বলে ঘোষিত, সংক্ষেপে তার তালিকাটি দাঁড়াল এই রকম ঃ

ক। শুষ্ক অঞ্চলে ১৭৪ বিলিয়ন ঘনমিটার জলের সরবরাহ এবং বন্যা - খরা নিয়ন্ত্রণ।

খ। ৩৪ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে জলসেচ।

গ। ১০১ টি জেলা ও ৫টি মহানগরে পানীয় জলের সরবরাহ।

ঘ। ৩৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন।

ঙ। কর্মক্ষেত্রে ৩৭ মিলিয়ন মানববর্ষ তৈরি।

চ। ৪ শতাংশ জি.ডি.পি বৃদ্ধি

তবে সমগ্র প্রকল্প সম্পূর্ণ হতে মোট খরচ ধরা হচ্ছে ৫৬০ হাজার কোটি টাকা এবং এই টাকা কিভাবে পাওয়া যেতে পারে তার কোন সন্ধান অবশ্য সেভাবে রিপোর্টে বলা নেই।

।। সংযোগে অসহযোগ ।।

নদী - সংযোগ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যটি হল উদ্বৃত্ত জল অঞ্চল থেকে ঘাটতি জল অঞ্চলে খালের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা। এক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি জলের হিসাব করা হয়েছে নদীর প্রবাহ বিচার করে। এই কারণেই বিভিন্ন খালের সাহায্যে গঙ্গা, মেচি, ব্রহ্মপুত্র আর কোশী নদীর জল প্রধানত দক্ষিণ ভারতে পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যে বিষয়টি একেবারেই হিসাবে রাখা হয়নি, সেটি হল অববাহিকায় বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা। গঙ্গার ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদের পরিমান হল ৫২৫ ঘন কিলোমিটার, অর্থাৎ যথেষ্টই বেশি। আর গাঙ্গেয় অববাহিকায় জনঘনত্ব হল প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৪১৩ জন, যেখানে ভারতের গড় জনঘনত্ব হল ২৫৬ জন প্রতি বর্গকিলোমিটারে। এই নদী অববাহিকায় মোট জনসংখ্যা হল ৩৫৬.৮ মিলিয়ন। তাহলে মাথা পিছু জলের প্রাপ্তি দাঁড়ায় ১৪৭৩ ঘনমিটার। অথচ গোটা দেশের ক্ষেত্রে এই পরিমান হল ১৮২০ ঘন মিটার। সুতরাং গঙ্গা নদীর ক্ষেত্রে 'উদ্বৃত্ত জল' কথাটাই অসম্পূর্ণ, যদিও গঙ্গা নদী থেকে জল নেওয়ার ব্যাপারটায় বেশ জোর দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গে আর যে বিষয়টি মনে রাখা প্রয়োজন যে, যদিও ভারতের মোট জলসম্পদের ৬০ শতাংশ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী দুটি বহন করে কিন্তু তাদের মোট জলের ৮০ শতাংশই জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরমাসের মধ্যে মৌসুমী বৃষ্টিপাত থেকে আসে। আর বছরের বাকী সময় সেখানে জলের অভাব থাকে। সুতরাং জলের গড়পড়তা হিসাবে উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি বার করা একেবারেই যুক্তিযুক্ত নয়।

রিপোর্টে যে খালের সাহায্যে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র থেকে জল আনা হবে বলা হয়েছে, তার ধারণ ক্ষমতা ধরা হয়েছে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ কিউবেক বা ১৪০০কিউমেক। অথচ ফারাক্কার কাছে গঙ্গায় বা পান্ডুর কাছে ব্রহ্মপুত্রে সর্বোচ্চ জলপ্রবাহের পরিমান দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৫৯০০ কিউমেক এবং ৭২৭২৬ কিউমেক (দ্র)। তাহলে কিভাবে ঐ খালের সাহায্যে টেনে নেওয়া মাত্র ১৪০০ কিউমেক জলবন্যা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে, এর কোন দিশা রিপোর্টে দেওয়া নেই।

নদী - সংযোগ প্রকল্পের আরও একটি অনুকূল দিক যেটি দেখান হয়েছে, সেটি হল অন্তত পক্ষে ৩৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে। কিন্তু যে হিসাবটা বাদ গেল, সেটি হল আরও অনেক বেশি বিদ্যুৎশক্তির ব্যয় হবে। কারণ ভারতের বিভিন্ন অংশে স্বাভাবিকভাবেই ভূমির উচচতার পার্থক্য আছে। বিশেষ যখন পূর্বভারত থেকে জল দক্ষিণ ভারতে পৌঁছে দেওয়া হবে তখন জলকে বেশি উচচতায় টেনে তুলতে হবে। এর জন্যে পাম্পের সাহায্য চাই, চাই

পাম্প চালু রাখার জন্য বিদ্যুৎশক্তি। আমেরিকা ক্যালিফোর্ণিয়ায় এই রকম পাম্পের সাহায্যে সব মিলিয়ে মোট ২.৫ কিলোমিটার উচচতায় জল তোলার খরচ পড়ে বার্ষিক১২৫,০০০,০০০. ডলার সেই হিসাবে দাক্ষিণাত্যের ম ালভূমিতে জল তোলার খরচ পড়বে বার্ষিক প্রায় ২৫০,০০০,০০০ ডলার (পালকি)। সুতরাং এই খরা সামলে পরিকল্পনা কতটা সাফল্য পাবে সেই ব্যাপারে প্রশ্ন থেকেই যায়।

আমাদের এই রাজ্যে আরও এক অন্যরকম সমস্যা আছে। বিভিন্ন নদী সংযোগকারী মুখ্য খালের মধ্যে দুটি খাল এই র াজ্যে প্রবাহিত গঙ্গা নদী থেকে খনন করা হবে। তার মধ্যে একটি বিস্তৃত হবে পশ্চিমের মালভূমির দিকে এবং অপরটি ভ াগরথী -হুগলি নদীর ডান তীর বরাবর সোজা দক্ষিণে সুন্দরবন পর্যন্ত। কিন্তু সুন্দরবন অঞ্চলটি হুগলি নদীর বামতীরে। তাহলে কিভাবে দ্বিতীয় খালটি নদী পেরিয়ে ডান থেকে বামতীরে যাবে পরিষ্কার নয়। দুটি খালই শু হবে ফারাক্কা অঞ্চল থেকে এবং পশ্চিমবঙ্গের ঐ অংশটি বেশ সংকীর্ণ। কাজেই এই খালদুটির জন্য যে জমি নিশ্চিহ্ন হবে, তার ফলে ফারাক্কা অঞ্চলটিতে আরও জল ও জমির কাটাকুটিতে জমির অভাব যেমন বাড়বে, তেমনই পরিবহণগত ও অন্যান্য সমস্যা ছ াড়াও ফিডার ক্যানালের ওপর নেতিবাচক প্রভাব অস্বাভাবিক নয়।

প্রকল্পের সুবিধার দিকটিই শুধুমাত্র বিচার করে চার শতাংশ জি.ডি.পি. বৃদ্ধির কথা বলা হল, কিন্তু হিসাবে আনা হল ন া কমপক্ষে ৭৯১৯২ হেক্টর বনাঞ্চল জলে ডুবে যাবে, সাড়ে চার লক্ষ লোক তাদের জমি হারাবে আর তাদের পুনর্ব াসন দিতে হবে, ভাবা হল না প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে যে বিশাল খরচ হবে, অবশ্যম্ভাবীভাবে যার অনেকটাই আসবে ঋণ থেকে, যে ঋণ পরিশোধ করতে হবে, তার সবকিছু হিসাবে রেখে ঐ চার শতাংশ জি.ডি.পি. বৃদ্ধি আদৌ সম্ভব কিনা। অ ার খরা এলাকায় যে সব কৃষকের জন্য জল আনা হবে, যে বিশাল অঙ্কের টাকা ঐ প্রকল্পে খরচ করা হবে তার কিছুটা অংশ যে তাদের কাছে জল বিক্রী করে সংগ্রহ করা হবে না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

এই ধরনের নদী সংযোগ প্রকল্প যার মাধ্যমে, ন্যাশনাল রিভার গ্রিডের কথা বলা হচ্ছে, যে সংযোগকারী খালগুলি দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত হবে, এক রাজ্য থেকে জল নিয়ে অন্য রাজ্যে পৌঁছে দেবে, সেই প্রকল্প কোন প্রশ্ন ছাড়াই সব রাজ্য মেনে নেবে না। ইতিমধ্যেই বিহার, কেরালা, আর অসম সরকার তাদের অসহযোগিতার কথা জা নিয়েছে। যদিও কেন্দ্রে সেই সাংবিধানিক ক্ষমতা রয়েছে যেখানে রাজ্যের অসহমতেই এই কাজ করা সম্ভব। কিন্তু রাজ্যে রাজ্যে যে বিরোধিতা, যে অসন্তোষের বাতাবরণ তৈরি হবে, গোটা দেশের পক্ষে মোটেই স্বস্তিদায়ক হবে না। এখনই তে া নদীর জল ভাগাভাগি নিয়ে বহু দ্বন্দ্বে কেন্দ্র জেরবার। যেমন, কাবেরী নদীর জল নিয়ে কর্ণাটক ও তামিলনাড়ু সরক ারের মধ্যে বিরোধ, ওদিকে ভবানী নদী ঘিরে তামিলনাড়ু সরকারের সঙ্গে কেরালার বিরোধ, অথবা ইন্দ্রাবতী নদীর জলবন্টন নিয়ে সমস্যা উড়িষ্যা ও ছত্তিশগড়ের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করেছে। এমন উদাহরণ আরও আছে।তবে এর থেকেও তীব্র সমস্যা হতে পারে বাংলাদেশ ও নেপালের দিক থেকে। একথা সত্য যে গঙ্গা - ব্রহ্মপুত্রের নিচের অংশ ব াংলাদেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত। তাই নদীর ওপরের অংশের জলের পরিবর্তিত ব্যবহারে তাদের আপত্তি অসঙ্গত নয়।

তবু বন্যা ও বিশেষত খরা পরিস্থিতির সংকটকে প্রাধান্য দিয়ে বাকি সব সম্ভাব্য অসুবিধাকে যদি অস্বীকার করে এই প্রকল্পের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে যে সব নদীকে ঘিরে এই পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে, সেই সব নদীও ত াদের স্বাতন্ত্র কতটা বজায় রাখতে পারবে, সেই পরিবর্তন সম্পূর্ণ বুঝে ওঠা এখনই সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে নদীতে প্রবাহিত প্রতিটি জলকণাই মূল্যবান, প্রতিটিই সেই নদীর চরিত্র নির্ধারণে ভূমিকা যেন। যখনই বিভিন্ন নদীকে পরস্পরে যুক্ত করা হবে এবং এক নদীর জল অন্য নদীতে পরিবাহিত হবে, তখন নদী অববাহিকার যে প্রাকৃতিক বিভাজন থাকে তা নষ্ট হবে। স্বাভাবিকভাবেই একটি নদীর অববাহিকাভিত্তিক কাজও পরিবর্তিত হবে। আমাদের দেশে এই ধরনের প্রকল্প এখনও শু না হলেও পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে নদী - সংযোগের প্রভাব জানা যায়, এবং সেই প্রভাব কখনই অনুকূল হয়নি। পূর্বতন সেভিয়েত রাশিয়ার অবস্থিত আরল সাগরে দুটি উল্লেখযোগ্য নদীর মোহনা রয়েছে, আমুদরিয় া আর সিরদরিয়া। এই দুই নদীর জলে আরল সাগর জলশালী ছিল। প্রায় ১০০০ ঘন কিলোমিটার জল অ ার৬৬০০০ বর্গ কিলোমিটার বিস্তার নিয়ে এটি পৃথিবীর তৎকালীন সরকার একপ্রকল্প গ্রহণ করে আমুদরিয়া ও সিরদরিয়া নদী দুটির জলপ্রবাহের প্রায় সবটাই ঘুরিয়ে দেয়। এর প্রাথমিক সাফল্য হিসাবে সেচসেবিত এলাকা একল

াফে ২.৫ মিলিয়ন থেকে বেড়ে হল ৭.৯ মিলিয়ন হেক্টর জমি। কিন্তু ধীরে ধীরে আরল সাগর শুকিয়ে যেতে লাগল এবং বর্তমানে এই হ্রদ তীরবর্তী অঞ্চল 'disaster Zone' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। বর্তমানে এই হ্রদে জলের পরিমান মাত্র ৩৫৪ ঘন কিলোমিটার, আর আয়তন ৩৮০০০ বর্গ কিলোমিটার। সম্প্রতি আরল সাগর সম্পর্কে World Bank - এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'the large scale diversions created an ecological and human disaster. Increasingly saline soils reduced agricultural productivity resulting in some of the worst poverty in the region.'

একই ভাবে কাজাকস্তানেও শুষ্ক অঞ্চলে জল সরবরাহের তাগিদে ইরতিস নদী থেকে খাল কাটা হল কারাগান্ডা অঞ্চল পর্যন্ত। কিন্তু বর্তমানে এই প্রকল্পটিও প্রায় অকার্যকরী হয়ে উঠেছে মূলত ব্যবস্থাটাকে চালু রাখবার জন্য অর্থের অভ াবে। তুরস্কে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদুটিকে কেন্দ্র করে যে 'ত্রপ্সত্তব্ধড়-ন্দ্বব্দব্ধন্দ্বক্ত ট্ট্রব্ধপ্সপ্তন্ত্র ত্নক্তপ্সন্দন্দ্বন্তব্ধ' এর ক াজ শু হয়েছে, তাও শেষ হবার আগেই ত্রমশ সমস্যামুখী হয়ে উঠছে, যেমন লবণতার সমস্যা, যেমন সেচের খরচবৃদ্ধির সমস্যা, বা বাজেটের তুলনায় আরও খরচ বৃদ্ধির সমস্যা।

কাজেই আমাদের দেশে নদী - সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন নদীর জল স্থানান্তর শু করবার আগে এইসব উদাহরণ থেকে ঋ্লেষণ করা প্রয়োজন। আদৌ বিশাল খরচ করে কতটা লাভ আমরা পেতে পারি। বিশ্বের উন্নত দেশগুলি বড় বড় পরিকল্পনা করেনদীর জলে এই ধরণের ব্যবহারের পদ্ধতিকে বাতিল করেছে। আমরা নিশ্চয়ই নদী-সংযোগের মাধ্যমে নদীর মৃত্যু চাইব না। নদী - সংযোগকে সড়ক সংযোগের সঙ্গে বা River Grid - কে ত্নপ্সভ্রন্দ্বক্ত ঋ্বক্তন্স্ত - এর সঙ্গেও তুলনা করে এর কার্যকারিতাকে বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু যে মূলগত ফারাকটা এখানে রয়ে গেছে, সেটি হল সড়ক পথে বা পাওয়ার গ্রিডে উভয়মুখী প্রবাহ চলে, আর নদীর প্রবাহ একমুখী। মনে রাখতে হবে নদী শুধুমাত্র প্রবহমান জলধ ারা নয়যাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, ইচ্ছাধীন ব্যবহার করা যায়, প্রকৃতপক্ষে নদী - অঞ্চল হল একটি ভূবিজ্ঞান নির্ভর, রাস ায়নিকও জৈবিক প্রত্রিয়ার গতিশীল অবস্থা এবং প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক তথা সামাজিক ত্রিয়ার দ্বান্দ্বিক ক্ষেত্র।

।। জল ও ঋ্বায়ন ।।

ভারতে অঞ্চলভেদে যে জল ও জলহীনতার সমস্যা, তার থেকেই তো নদী - সংযোগ প্রকল্পের উদ্ভব। কিন্তু এই সমস্যা পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই। আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই এই সমস্যা ত্রমশঃ গভীর হয়ে উঠছে। যেভাবে তেলের জন্য মধ্যপ্র াচ্যের দেশগুলির ওপর পশ্চিমী দুনিয়ার শক্তির আস্ফালন ঘটতে, যেভাবে তৈরি করা হচ্ছে একের পর এক যুদ্ধ, আশঙ্কা করা হচ্ছে, হয়ত সেভাবেই অদূর ভবিষ্যতে জলের জন্য যুদ্ধ শু হবে। ভারতসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মৌসুমি বাতাস থেকে যে বৃষ্টিপাত হয়, তেমন বৃষ্টিবহুল অঞ্চলএলাকা ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও নেই। তাই সেদিক থেকে ভারত অনেক দেশের তুলনায় জলসম্পদে সমৃদ্ধ। সেই ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদের অনেকটাই মাটির নিচে ভৌমজল হিসাবে সঞ্চিত আছে। আমাদের অজান্তেই, ধীর অথচ নিশ্চিতভাবে সেই জলসম্পদের দখলদারী চলে যাচ্ছে বহুজাতিক কো ম্পানীদের হাতে। 'এ্যাকোয়াফিনা' বা 'কিনলে' নামে বোতলের যে জল আমরা অর্থ দিয়ে কিনি, আমাদের একান্ত প্রয়ে াজনীয় জৈবিক তৃষ্ণাকে নিবৃত্ত করি, তা আমাদের দেশেরই জল। আগামীর সবচেয়ে মহার্ঘ্য সম্পদ, যা আমাদেরদেশে এখনও পর্যাপ্ত, যাকে প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়বদ্ধতা সরকারের থাকা উচিত ছিল, এভাবেই তার মালিকানাচলে যাচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানীদের হাতে, আর এভাবেই শু হয়ে গেছে জলের ঋ্বায়ন। সরকারী তথ্য অনুয ায়ীই যে ১৯ কোটিমানুষের কাছে এখনও বিশুদ্ধ জল পৌঁছায়নি, তাদের তৃষ্ণার্ত রেখেই জল বিত্রী হয়ে যাচ্ছে ব্যক্তি মা লিকানায়। এই যে ৫৬০,০০০ কোটির টাকা খরচের পরে একটি প্রকল্প সম্পূর্ণ হবে, তারজন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থার কাছ থেকে যে ঋণ নেওয়া হবে, তা নিশ্চয় নিঃশর্তে হবে না। সেই শর্ত সাপেক্ষে যে জল চাষীদের জমিতে জমিতে পৌঁছে যাবে, তার কতটা অধিকার তাদের হাতে থাকবে।হয়ত জলও খোলা বাজারে আরও একটি পণ্য হয়ে উঠবে। ঋ্বায়ন তো এভাবেই সবকিছুকে পণ্য করে তোলে, এমনকি মানুষের সেই জৈবিকচাহিদাকেও, এমনকি জলকেও। আমরা তো অনেকেই জানি না ছত্তিশগড় রাজ্যে প্রবাহিত শেওনাথ নদীর ২৬ কিলোমিটার প্রবাহ পথকে ব্যক্তি মালিকানায় দেওয়া হয়েছে । এক্ষেত্রে এক পক্ষে স্বয়ং রাজ্য সরকার আর অপরপক্ষ (M/s Radius Water Inc.) নদীর ঐ অংশের দুই তীরের মানুষ যারা তাদের নিত্য প্রয়োজনে নদীর জল ব্যবহার করত, হঠাৎই দেখল সেই

নদীও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে গেছে। পুকুর চুরি তো অনেক সাধারণ ঘটনা। তাই নদী-সংযোগ প্রকল্পে যে সব বাঁধ তৈরি হবে, যে সব খাল তৈরি হবে, তাদেরমালিকানা নদীসহ জলের অধিকারের ওপর হয়ত 'de factor' হিসাবেই কাজ করবে।

।। জল ও রাজনীতি ।।

'Control over water has again and again provided an effective means of consolidating power within the human groups-led, that is, to the assertion by some people of power over other' (Worster, 1985).

আমাদের দেশে জল নিয়ে রাজনীতি, কখনও বা জালিয়াতি কোন নতুন কথা নয়। নদীর জলকে ব্যবহার করবার উদ্যোগ আমাদের দেশে প্রথম নিয়েছিলেন ডঃ মেঘনাদ সাহা। নেহের সভাপতিত্বে গঠিত জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসাবে তিনি বন্যাপ্রবণ দামোদর নদীকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য বড় বাঁধ গঠনের কথা বলেন। আমেরিকায় টেনেসি ভ্যালির অনুকরণে তিনি দামোদরে বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ আগ্রহী হন। স্বাধীনতার পর বড় বাঁধ নির্মাণের পক্ষে যুক্তি আরও জোরাল হতে শু করে।

কাজেই বড় বড় বাঁধ তৈরি করে নদীর জলকে বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগী করে তোলবার জন্য বহুমুখী নদী প্রকল্পের উদ্ভব হল। ভারত ভাগের যে ক্ষতি পাঞ্জাবকে নিতে হয়েছে, তার ক্ষোভ প্রশমনে ভারত সরকার ভাকরা - নাঙ্গাল বহুমুখী নদী প্রকল্পটি গ্রহণ করে। ভাকরাতে বাঁধ নির্মাণ করবার জন্য পাকিস্তানে শতদ্রু নদীতে যে জলাভাব দেখা দিতে পারে, তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে ভারত সরকার কাশ্মীরে মঙলা বাঁধ তৈরির জন্য পাকিস্তান সরকারকে টাকা দিতে বাধ্য হয়। পশ্চিমবঙ্গে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের সদম্ভ উপস্থিতিদামোদর প্রকল্পের অনুমোদনে সহায়ক হয়। এছাড়া উড়িষ্যার মহানদীতে হীরাকুদ প্রকল্পের কাজ শু হয়। কারণ মহানদীতে বাঁধ গঠনকরে তথাকথিত বহুমুখী উন্নয়নের জলছবি দেখিয়ে ঐ রাজ্যে কংগ্রেস পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল। সুতরাং রাজনৈতিক কারণেই ভারতেপ্রথম তিনটি বৃহৎ নদীর বাঁধের অবস্থান হয়েছিল। পরবর্তী সময়েও দেখা যায় নদীতে বড় বাঁধ নির্মাণের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক ফয়দাতোলার চেষ্টা অব্যাহত। হিমালয়ের তেহরি বাঁধ নির্মাণ এমনই এক উদাহরণ। পরিবেশের অবনমনকে বিন্দুমাত্র গুত্ব না দিয়েই ঐ বাঁধ গড়ে তোলা হয়েছে। এই ঘটনা নর্মদা নদীতে বাঁধ দিয়ে সর্দার সরোবর গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও। জলাধার নির্মাণের জন্য যে বিপুল পরিমান অরণ্য নিশ্চিহ্ন হবে, যে বিরাট সংখ্যক মানুষ বাস্তুহারা হবে, যে পরিবেশ ভারসাম্য নষ্ট হবে, তার কোন হিসাব কোনদিনই করা হয়নি। তবু যদি সর্দার সরোবর বাঁধের উচ্চতা কিছুটা কমান হত, তাহলে হয়ত পরিবেশ আর প্রকৃতি, আর সেইসব সাধারণ মানুষ অনেকটাই বাঁচতে পারত। অথচ কোর্ট নির্দেশ দিল উচ্চতা আরও বৃদ্ধি করবার। এভাবেই অগ্রাহ্য করা হল সাধারণ মানুষের যাপিত জীবনকে।

'এমনকি কেবল অগ্রাহ্য করা নয় সরাসরি মিথ্যাচার করা হয় দেশের সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে। উত্তরপ্রদেশের মেটাতে নদী বাঁধ তৈরির জন্য উচ্ছেদ হওয়া গ্রামবাসীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। ১৯৮৭ সালে ২৩শে মার্চ কাছাকাছি জমিরপুরায় উপনির্বাচন থাকার দণ তিনদিনের মধ্যে সেই অঞ্চলের গ্রামগুলির লোকেদের হাতে জমির পরিমান অনুযায়ী এক থেকে কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্তচেকে মোট কুড়ি লক্ষ টাকা দিয়ে দেওয়া হল। ২০শে মার্চ তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোপীনাথ দীক্ষিত বিরাট উৎসবে উচ্ছেদ হওয়া লোকেদের মধ্যে ক্ষতিপূরণের চেক বিলি করলেন। ২৩শে মার্চের ভোটে এই অঞ্চলের প্রচুর ভোট পেয়ে প্রত্যাশিত দলের প্রার্থী জিতলেন।এরপর গ্রামের লোকেরা এর তার কাছে ২০০ টাকা ধার নিয়ে শহরে গিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে নিজেদের দু হাজার, দশ হাজারের চেক জমা দিলেন।

প্রত্যেকটি চেক বাউন্স করেছিল। এটা বানানো ঘটনা নয়। এত তেতো ঘটনা বানানোর সাধ্য কলমের থাকে না।

কচ্ছ অঞ্চলের জলবঞ্চিত মানুষগুলিকে পনের বছর ধরে দেখানো হয়েছে এক সজলতার স্বপ্ন। সর্দার সরোবর ও নর্মদা সাগর বাঁধ নির্মিত হলেই আর জলকষ্ট থাকবেনা এই দরিদ্র মানুষগুলি -- একথা বলে নর্মদা আন্দোলনের বিদ্ধে ব্যাপক জনসমর্থন জোগাড় করেছিলেন গুজরাট সরকার যখন নাকি নর্মদা সেচ পরিকল্পনার সুদূরতম প্রান্তেও নেই কচ্ছে পৌঁছবার কোনও বাস্তব সম্ভাবনা।' (জয়া মিত্র, ১৯৯৯)

আমাদের দেশে তাই বড় বড় নদী বাঁধ নির্মাণ কখনই রাজনীতি নিরপেক্ষ নয়। যদিও পৃথিবীর সব উন্নত দেশই যখন

বুঝতেপেরেছে বড় বাঁধ তৈরি করে আখেরে নদীকেই ধবংস করা হয়, তাই ১৯৯৯ সালের পর থেকে আমেরিকায় একে একে বাঁধগুলি গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, তবুও আমাদের দেশে তৈরি হয়ে চলেছে একের পর এক বড় বড় নদী বাঁধ। আর এই কারণে তাই পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার ভাঙন ঘিরে ভোটের বাজার তৈরি হয়, ওদিকে পাড় ভাঙতেই থাকে, অনেক ম ানুষের জমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তারা না - মানুষ হয়ে বেঁচে থাকে। নদীও তাই একটা অবশ্যম্ভাবী ইশু হয়ে ওঠে।

।। বিকল্প পথের সন্ধান ।।

নদী - সংযোগ প্রকল্পের বিরোধিতায় দাঁড়িয়েও একটা বিষয় মেনে নেওয়া সম্ভব নয় যে, ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল খর ার শুষ্কতায় ধুঁকতে থাকবে । বন্যা পরিস্থিতি এক সাময়িক সমস্যা সৃষ্টি করলেও তার মোকাবিলা সম্ভব। নদী - নিয়ন্ত্রণ নয় নদী - ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে বন্যার সঙ্গে বেঁচে থাকা যায়। বন্যার সদর্থক দিকটিও আমাদের প্রয়োজন। যে প্লাবন - পলি জমিতে জমা হয়, বন্যা পরবর্তী বছরে সেই জমির উর্বর পলি ফসনের ফলনে জোয়ার নিয়ে আসে । এর বিপরীতে, খরা মানুষের জীবনে ক্রমাগত হতাশা নিয়ে আসে। তাই খরা অঞ্চলের জন্য চাই বিকল্প ভাবনা। যদিও শুষ্ক অঞ্চলে কৃষির জন্য আমাদের দেশে বহু স্থানে সুপ্রাচীন সময়কাল থেকে বিভিন্ন স্থানীয় পদ্ধতি চালু ছিল এবং সেই সব পদ্ধতি স াফল্যও পেত। কিন্তু বহুমুখী নদী প্রকল্পের ধারণা এই সব গ্রামীণ ব্যবস্থাকে ধবংস করে দিয়েছে। জল নির্ভর কৃষিব্যবস্থ াকে এতটাই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যে শুষ্ক অঞ্চলেও যেভাবেই হোক জল এনে সেচের মাধ্যমে ফসল ফলানোর ভাবনা ক্রমশই বাস্তব সত্য হয়ে উঠছে, ফলে যেখানে জলধারা থেকে খাল এসে পৌঁছায়নি, অথবা ভৌমজলের সঞ্চয় তেমন নেই, সেখানে ভাল কৃষি ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। তবু আমরা কৃষিনীতিতে কখনই শুষ্ক কৃষিপদ্ধতি প্রচলনের কথা বলিনি।। এই রাজ্যেও বাঁকুড়া - পুরলিয়া জেলায় যেখানে সেভাবে সেচ ব্যবস্থা পৌঁছে যায়নি, যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিম ান কম, সেখানেও জলনির্ভর ধানকেই প্রধান ফসল হিসাবে নির্বচন করা৪ হয়। যে কথা মনে রাখা প্রয়োজন, তা হল, এই দেশের সর্বত্রই সামান্য হলেও বৃষ্টি হয়, তাই বৃষ্টি জলকে চাষের কাজে ব্যবহার করবার উপায়গুলি ভাবা দরকার, সেই জলকে ধরে রাখবার চেষ্টা করা দরকার, তাহলে অতি শুষ্ক অঞ্চলেও কৃষিকাজ সম্ভব, এমনকি জলের অভাবও অনেকটাই দূর করা সম্ভব। রাজস্থানের আলোয়ারে বা লাপোডিয়া গ্রাম প্রমাণ করেছে এই ব্যবস্থা কতটা বাস্তব। আলে ায়ারে বৃষ্টি হয় পুলিয়ারও পাঁচ ভাগের এক ভাগ। সুদীর্ঘ শুষ্কতায় সেখানে কোন চাষবাস সম্ভব ছিল না। তখনই কোলে ায়ালি গ্রামের প্রাচীন মানুষদের বুদ্ধিতে আর নবীনদের শ্রমে তৈরি হল অনেকগুলি ডোহড় বাঁধ। সেই সব বাঁধ ধনুকের মত বাঁকানো যাতে জলের চাপে ভেঙে না যায়। যে সামান্য বৃষ্টি সেখানে হয়, তাকেই ঐ সব বাঁধের সাহায্যে আটকে র াখা হল। এইভাবে পাঁচ বছর। তারপর বৃষ্টির জমা জলে পুকুর বা তালাও তৈরি হল, মাটি ভিজল, ফসল ফলল, কোন বহুমুখী নদীপ্রকল্পের সুবিধা না পেয়েও আলোয়ার এখন সবুজ, জলহীনতার সমস্যামুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের পুলিয়ার ব াঘমুন্ডীতেও এখনই জোড়বাঁধআছে। আবার পশ্চিম হিমালয়ের সুখোমাজারি গ্রামে ছোট ছোট আয়তাকার গর্ত খুড়ে বৃষ্টির জল ধরে রেখে দীর্ঘ খরাকে কাটিয়ে উঠেছে। এমন সব পদ্ধতি আমাদের দেশে বহুকাল ধরেই ছিল, বিশালত্বের নেশা সনাতনী অথচ বিজ্ঞাননির্ভর কৃষি পদ্ধতিকে ভুলিয়ে দিয়েছে। এক সময় নেহে বড় নদীবাঁধকে নতুন যুগের দিশারী হিসাবে ভেবেছিলেন, তিনিও পরে বুঝেছিলেন সমাজ এক বিশালত্বের অসুখে ভুগছে। তাই খরা মোকাবিলায় বৃষ্টিনির্ভর কৃষির ওপর জোর দেওয়া অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত।

হিসাব করে জানা যায় ভারতের সারা বছর ধরে যে মোট ৪০০০ ঘন কিলোমিটার জল বৃষ্টি থেকে পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই আসে ১০০ ঘন্টা বৃষ্টিপাতের মধ্যে, যেখানে বছরে মোট ৮৭৬০ ঘন্টা বৃষ্টি হয় (দ্র)। সুতরাং ১০০ ঘন্টার মধ্যে যে প্রচুর বৃষ্টির জল পাওয়া যায় তাকে ধরে রাখতে হবে সারা বছরের বৃষ্টিহীন সময়ের জন্য। যদি এক হেক্টর অ ায়তনের জমি ১০০ মিমি বৃষ্টিপাত ধরে রাখা যায়, তবে তার থেকে আমরা এক মিলিয়ন লিটার জল পেতে পারি (অ ালম)। দক্ষিণ, মধ্য বা পশ্চিম ভারতের শুষ্কতম অঞ্চলেও বছরের সামান্য বৃষ্টির জলইসংরক্ষণ করতে পারলে খরামুক্ত পরিবেশ পাওয়া সম্ভব।

পাশাপাশি যেটা সমান প্রয়োজন, পরিবেশ নির্ভর খাদ্যাভ্যাস ও ফসল নির্বাচন। কেন বাঁকুড়া ও পুলিয়ার মানুষকে দুই বেলাই ভাত খেতে হবে। ধানের পরিবর্তে যেখানে জোয়ারের চাষে জোর দিলে জলের চাহিদা অনেকটাই কমে যাবে।

প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে বাংলাদেশ থেকে যে মানুষেরা এখানে এসেছে, তাঁদের অনেকেই চার বেলা ভাতের পরিবর্তে, এক বেলা ভাত, একবেলা টি খেয়ে দিব্যি ভালো আছেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে গুজরাট রাজ্যটি কৃষি ও শিল্প দুয়েতেই প্রথম সারিতে। অথচ গুজরাটে বেশি বৃষ্টি হয় না, পশ্চিম অংশটা তো রীতিমতন শুষ্ক, গুজরাটে তেমন কোন বড় নদী বাঁধ নেই। তাই সেখানে ধান বা গম প্রধান খাদ্যফসল নয়। শুষ্ক অঞ্চলে অতিরিক্ত জল টেনে আন ার চেষ্টা না করে স্থানীয় বৃষ্টির ওপরই মূলত নির্ভর করে জোয়ার ও বাজরার চাষ হয়। এই সব ফসল শুষ্ক অঞ্চলের ফসল, বেশি জল চায় না। এক বিরাট সংখ্যক অধিবাসী বাজরার টিকেই প্রধান খাদ্য হিসাবে গ্রহণকরে। সেখানে অর্থক ারী ফসল হিসাবে ইসবগুল, সাদা জিরে, প্রভৃতি জল মিতব্যয়ী ফসলের চাষ হয়। পরিবেশকে নির্ভর করেই সেখানে কৃষি উন্নত হয়েছে।

তাই, ভাবনা চাই, নতুন ভাবনা। একটা বিকল্প পথ চাই। পরিবেশ যা দিচ্ছে, সেটুকু কাজে লাগাবার প্রযুক্তি চাই, সদিচ্ছা চাই। বাস্তব ভূমিতে দাঁড়িয়ে নদী সংযোগ প্রকল্পের কোন দৃঢ় ভিত নেই। প্রকৃতিতে উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি বলে কিছু হয় না। সেটা হয় সমাজজীবনে, এই সাধারণ সত্যটুকু আমরা আর কবে বুঝব।

।। তথ্য উৎস ঃ ।।

River Linking: A Millennium Folly? - Medha Patkar (ed)
Survey of the Environment – The Hundu 2003
Sanctuary Asia, VOL. XXIII, No. 1. February 2003
ভূমিজল - জয়া মিত্র
যোজনা - জুলাই ২০০৪
যোজনা - জুন ২০০৫
কালধবনি - অক্টোবর, ১৯৯৯
কালধবনি - জানুয়ারি, ২০০৪